

# দলীয় রাজনীতিতে এনজিওঃ কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

দারিদ্র বিমোচনে এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রাঞ্চল কার্যক্রম ঠিক কতটুকু সফল তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকাকে সকলেই স্বীকার করেন। তবে কিছু এনজিওর ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নানা অভিযোগ আসছে। এর মধ্যে একটি এনজিও বার বার আলোচ্য-সমালোচিত হচ্ছে দলীয় রাজনীতিতে, বিশেষ করে একটি দলের জঙ্গী কর্মসূচিতে তার কর্মী ও সমিতি সদস্যদের অংশগ্রহণ নিয়ে। এনজিওটিতে কিছুদিন কাজ করার সুবাদে তার এমন কিছু কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছিলাম বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মনে হচ্ছে সেগুলি ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ও কৌশলগত লক্ষ্যের প্রস্তুতি। নীচে তার কয়েকটির উপর আলোকপাত করা হলো।

১. ১৯৯৭ সালের শেষের দিককার কথা। এনজিওতে কাজ করতাম একটি বিভাগের প্রধান হিসাবে। সবে দুপুরের খাবার শেষ করেছি। প্রশাসন থেকে জানানো হলো যে বিভাগীয় প্রধানদের জরুরী মিটিং ডাকা হয়েছে বেলা তিনটায়। প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় ব্যক্তি, তখন পদবী ছিল পরিচালক, তিনি সভাপতিত্ব করছিলেন। কোন রকম রাকঢাক না রেখে তিনি বললেন যে অনেক চেষ্টা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচন পিছানো হয়েছে। এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিকে জেতাতে হবে। এজন্য করণীয় সম্পর্কে তিনি বললেন, এনজিওটির সকল কর্মীকে তাদের চেনা-জানার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সকল গ্রাজুয়েটদের খুঁজে বের করতে হবে যারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির সমর্থক। তারা যদি নিজেদের নাম রেজিস্ট্রি করে না থাকে তাহলে কর্মীদের উদ্যোগে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করাতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগেই নির্দিষ্ট দিনে তাদেরকে ভোট দিতে নিয়ে যেতে হবে। তাঁদের রেজিস্ট্রেশন, চাঁদা পরিশোধ, যাতায়াত এবং আনুসঙ্গিক সকল খরচ এনজিওটি থেকে বহন করা হবে।

২. এ সময়ে নিয়োগ সম্পর্কিত একটি নতুন বিধি করা হয়। তাতে বলা হয় মাদ্রাসা শিক্ষিত কাউকে নিয়োগ দেয়া যাবে না এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নয় এমন কেউ যেন প্রতিষ্ঠানটিতে ঢুকে পড়তে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শেষোক্ত উদ্দেশ্যে পূরণে নিয়ম করা হয় যে মৌখিক পরীক্ষা পর্বে পাঁচজন পরীক্ষক থাকবেন যাদের মধ্যে একজন থাকবেন নারী বিষয়ক মূল্যবোধ পরীক্ষার জন্য এবং একজন পরীক্ষা করবেন ‘উন্নয়ন মূল্যবোধ’। উন্নয়ন মূল্যবোধ যাচাই করার জন্য কি ধরনের প্রশ্ন করতে হবে তার নমুনাও পরিপত্র দেয়া হয়। নমুনাগুলো ছিল এ রকম, ‘আপনি কি মনে করেন যে ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করবে’, ‘স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে কোনটিকে আপনি বেছে নিবেন’। যেন কোন বুদ্ধিমান পরীক্ষার্থী প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস ঢাকতে না পারে সে জন্য মানব সম্পদ বিভাগের কয়েকজনকে এ উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানে বিশেষ প্রশিক্ষণও দিয়ে আনা হয়।

এটি সকলেই বুঝতে পারছিল যে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছাড়া দেশের অন্য কোন নাগরিক যাতে এনজিওটিতে ‘ঢুকে পড়তে’ না পারে সে উদ্দেশ্যেই এ নতুন বিধি চালু করা হয়েছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না কেন একটি এনজিও তার কর্মীদের রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে এতো কড়াকড়ি করতে

যাচ্ছে। কেননা, আমাদের দেশের প্রধান দুটি দলের সাংগঠনিক কাঠামো বেশ ঢিলেঢালা। সেখানে যে কেউ যখন তখন যোগ দিতে পারে। নির্বাচনের সময়ে টাকাওয়ালা প্রার্থীদের নিয়ে যেভাবে তারা টানাটানি করে তাতে মনে করা অবাস্তব যে তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস বলে আসলেই কিছু আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা-কর্মী কিংবা পাড়ার নেতা-কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে দলও পরিবর্তন করে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে তারা যে দলে যেতে চায় সে দল থেকে কোন ধরনের বাধা থাকে বলে শোনা যায় না। নিজেদের মধ্যে আলোচনায় অনেকেই প্রশ্ন তুলছিলেন যে তাহলে কি এনজিওটি এমন কিছু করতে যাচ্ছে যা একটি রাজনৈতিক দলও করে না? একজন বয়োষ্ক সহকর্মী বলেছিলেন যে সম্ভবতঃ এনজিওটির এমন কোন ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে যাতে অতি মাত্রায় নিবেদিত কর্মী বাহিনী প্রয়োজন যারা গেরিলা বাহিনীর মত সংগঠিত থাকবে।

৩. একই সময়ে এনজিওটির পরিচালিত সমিতিগুলোর সদস্যদের উপর নিয়মিত জরিপ চালানোর ব্যবস্থাও করা হয়। প্রতি ছয় মাস অন্তর তখনকার ৭৬ হাজার সমিতির কয়েক লক্ষ সদস্যদের উপর এ জরিপ চালানো হতো, তা কম্পিউটার ডেটাবেজে গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট স্টেজেস নামে সংরক্ষণ করা হতো এবং সে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ করা হতো। জরিপের অধিকাংশ প্রশ্ন ছিল সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত, যেমন সমিতির সদস্যদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত, তাদের মাসিক আয় কত, তারা স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে কিনা ইত্যাদি। তবে তার সাথে কয়েকটি রাজনৈতিক প্রশ্নও ছিল, যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা কতটুকু, মৌলবাদী ধ্যান ধারণার প্রতি তাদের দুর্বলতা কোন স্তরের ইত্যাদি। প্রশ্নমালার ব্যবহার নির্দেশিকায় এগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত বলে দেয়া হতো। তাছাড়া এর উপর যে প্রশিক্ষণগুলো হতো তাতে খোলামেলা জানানো হতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি একনিষ্ঠতা বলতে বুঝানো হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলটির প্রতি একনিষ্ঠতা। একনিষ্ঠতার বিভিন্ন স্তরের বিষয়েও ব্যাখ্যা করা হতো। সর্বোচ্চ একনিষ্ঠতা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্য আত্মত্যাগ। পুরো জরিপের ফলাফল কম্পিউটার ডেটাবেজে সংরক্ষণ করার কারণে তার থেকে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ করা যেতো এবং তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। যেমন নিয়মিত দেখা হতো কোন কোন সমিতি রাজনৈতিকভাবে খারাপ করছে। সে সকল সমিতি রাজনৈতিক ভাবে প্রত্যাশিত মানের থাকতো না সগুলোর সদস্যদের মত তাদের দায়িত্বশীল কর্মীদেরও কপাল পড়তো। মূলতঃ এটি ছিল এনজিওটির সমিতির সদস্যদেরকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী বাহিনীতে পরিণত করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। এখানে উল্লেখ্য যে এ সকল জরিপ পরিকল্পনা ও তার থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতিবেশী দেশের নাগরিকসহ অনেক বিদেশী পরামর্শক কাজ করতেন।

৪. এনজিওটির একটি মিডিয়া বিভাগ রয়েছে। সাউন্ডপ্রুফ স্টুডিও, অত্যাধুনিক মুভি ক্যামেরা, অভিজ্ঞ ক্যামেরা ড্রু, অন-লাইন ভিডিও এডিটিং প্যানেল ইত্যাদি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে পুরো একটি সজ্জিত থাকতো। সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল সংরক্ষিত। কাগজে কলমে বিভাগের কাজ ছিল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সহায়ক প্রচারণা চালানো। প্রধান কার্যালয় পাঁচটা বাজতেই খালি হয়ে যেতো। একদিন বের হতে একটু দেরী হয়ে গেলো। নামার সময় দেখলাম পিছনে চাটাই খাড়া করে একজন বুয়া টাইপের মহিলার গুটিং হচ্ছে। ইংরাজী উচ্চারণ ভালো হবার কারণে মাঝে মাঝে মিডিয়া সেকসনে ডাক পড়তো বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্রের ইংরাজী সংস্করণে কণ্ঠ দেবার জন্য। একদিন দেখলাম সেই মহিলার সাক্ষাৎকার প্রামাণ্য চিত্রে স্থান পেয়েছে। মহিলাকে দেখানে হয়েছে গ্রাম্য নারী হিসাবে। সে বলছে যে তার এলাকার ইমাম সাহেব ফতোয়া দিয়ে তার কান কেটে দিয়েছে। ভিডিও এডিটিং এর মাধ্যমে রাজধানীর বহুতল ভবনে নেয়া

সাক্ষাৎকার প্রত্যন্ত গ্রামের বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিভাগের তৈরী বিভিন্ন ‘গ্রামণ্য চিত্র’ ভোটের এডুকেশনের নামে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তবে কোন প্রতিষ্ঠান তার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে রাজনৈতিক দলের জঙ্গী কর্মসূচি সফল করতে ব্যবহার করতে পারে কিনা কিংবা তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে একটি রাজনৈতিক দলের ক্যাডার হিসাবে তৈরী করতে পারে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড একটি দলের পক্ষে যাচ্ছে বলে আমরা অনেকে বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু অন্য এনজিওগুলোও যদি একই ধরনের কর্মসূচি নেয় তাহলে কি অবস্থা দাড়াবে সে বিষয়টিও চিন্তা করা প্রয়োজন এবং সে আলোকে খুব বেশী দেরী হবার আগেই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া দরকার।